বিরাজমান রাজনৈতিক বাস্তবতা ও নাগরিক ভাবনা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২০ এপ্রিল, ২০১৩)

বাংলাদেশ আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে। যুদ্ধাপরাধের বিচার, এ বিচারকে কেন্দ্র করে সারাদেশে জামায়াত-শিবিরের ব্যাপক সহিংসতা, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ীঘরে হামলা, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপি ও তার মিত্রদের হরতাল-অবরোধের মত বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি, যুদ্ধাপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে গণজাগরণ মঞ্চের আবির্ভাব, সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধি দলের দমনপীড়ন, হেফাজতে ইসলামের উত্থান ও তাদের ১৩ দফা দাবি, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা, সরকারের অব্যাহত অপশাসন ইত্যাদি ঘটনাবলী আমাদের জাতির জন্য আজ এক চরম অস্থির ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এ অস্থিতিশীলতা আমাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দিতে পারে। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আবারও খাদে ফেলতে পারে। এমনকি আমাদেরকে একটি জঙ্গি রাষ্টেও পরিণত করতে পারে।

কিন্তু প্রবল জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের ফলে সৃষ্ট বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হল মোটাদাগে **গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা**। মৌলিক মানবাধিকার এবং মানব সত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা। এসব লক্ষ্য বা মূল্যবোধ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে – অর্থাৎ এগুলো অর্জন আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের ৪২ বছর পরেও, এগুলোর অধিকাংশ অর্জিত হয়নি কিংবা যা কিছু অর্জিত হয়েছে তাও আজ ধূলিস্যাৎ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় কী?

বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে মোটাদাগে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(১) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঠেকাতে জামায়াত-শিবিরের ব্যাপক তাণ্ডব

যুদ্ধাপরাধের বিচার ভণ্ডুল করতে গত কয়েক মাসে জামায়াত-শিবির সারা দেশে ব্যাপক সহিংসতা সৃষ্টি করেছে। আইন ও শালিস কেন্দ্রের তথ্যানুযায়ী, গত তিন মাসে ১৭১ জন খুন হয়েছেন। এ সময়ে ২৩০টি সহিংস ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৬ হাজার ৪৯ জন। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর রায়ের পর সহিংসতায় নিহত হয়েছেন ১৩৭ জন। নিহতদের মধ্যে জামায়াত শিবিরের ৪৪ জন, পুলিশ ৯ জন, গ্রাম পুলিশ ১ জন, ৩ জন নারী, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কর্মী ও সমর্থক ১০ জন এবং সাধারণ মানুষ ৭০ জন। এছাড়া দেশের ১০০টি উপজেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হয়েছে। ওইসব হামলায় ৪২০টি মন্দির, বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। উপরন্তু মার্চ মাসেই বিএনপি-জামায়াতের ডাকে দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল হয়েছে ২৯টি (*যুগান্তর*, ২ *এপ্রিল* ২০১৩)।

লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর কোনো অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু ক্রমান্বয়ে এটি শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। আরও লক্ষণীয় যে, ১৯৯৩ সালে জাতীয় সংসদে জামায়াতকে নিয়ে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বিতর্কের ভিত্তিতে দলটিকে নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকারি ও বিরোধী দল ঐক্যমতে পৌঁছে। কিন্তু আমাদের বড় দুটি দল, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পৃষ্ঠপোষকতায় জামায়াত-শিবির সারাদেশে আজ ব্যাপক তাণ্ডব সৃষ্টি করার মত শক্তি অর্জন করেছে।

(২) গণজাগরণ মঞ্চের উত্থান

যুদ্ধাপরাধের বিচারকে কেন্দ্র করে সরকার ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে আঁতাতের অভিযোগে কিছু ব্লগার ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীর উদ্যোগে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ঢাকার শাহবাগ চত্বরে (পরবর্তীতে গণজাগরণ মঞ্চ বলে আখ্যায়িত) প্রতিবাদের আয়োজন করা হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও অপরাধীদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে সারা দেশে, বিশেষত তরুণদের মধ্যে বিরাজমান ব্যাপক জনমতের কারণে শাহবাগে প্রথম দিকে লাখ লাখ ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ ঘটে। অনেকের কাছে শাহবাগের আন্দোলন সকল অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সরকারের পক্ষ থেকে শাহবাগ আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করার অভিযোগ উঠে, ফলে আন্দোলনটি অনেকাংশে এর স্বতঃস্ফূর্ততা হারায় বলে অনেকে মনে করেন।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে শাহবাগ আন্দোলনের উদ্যোক্তা ব্লগারদের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ মহল থেকে নাস্তিকতার অভিযোগ এনে এটিকে ধিকৃত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ব্লগারদের মধ্যের কেউ কেউ নাস্তিক হতে পারেন, কিন্তু ঢালাওভাবে সবার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা অনভিপ্রেত। এছাড়াও কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে কারো ধর্মানুভূতিতে আঘাত হানা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও, ধর্মে অবিশ্বাসী হওয়া প্রচলিত আইনে অপরাধ নয়।

(৩) নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি সহিংস আন্দোলনের ফলে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে। গত দেড় দশকে এব্যবস্থাটি নিয়ে সারাদেশে একটি ঐক্যমত্য গড়ে উঠে এবং এটি একটি 'সেটেল্ড' বা মীমাংসিত বিষয়ে পরিণত হয়। তা স্বত্ত্বেও বিরাজমান জনমত এবং বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্টজনের সুপারিশ উপেক্ষা করে বর্তমান সরকার একতরফাভাবে অবিশ্বাস্যে দ্রুততার সঙ্গে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ২০১১ সালের ৩০ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি সংবিধান থেকে বিলুপ্ত করে। কিন্তু সংবাদপত্রের জরিপ অনুযায়ী, দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ নাগরিক মনে করে না যে, নির্বাচনকালীন একটি নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের ক্ষেত্রে অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অজুহাত ব্যবহার করা হয়, যদিও আদালত আরও দুই টার্মের জন্য ব্যবস্থাটি রাখার পক্ষে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন।

বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকে, দলীয় সরকারের অধীনে এবং সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর। পক্ষান্তরে, প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে অনড়। এমনকি বিএনপি ও ১৮ দলের শরিকরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন না করলে পরবর্তী নির্বাচন বর্জন করারও ইতোমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছে, যার ফলে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বর্তমানে এক চরম অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের এই অনড় অবস্থানের মূল কারণ হল – উভয় দলই মনে করে যে, তারা তাদের দাবি থেকে সরে আসলে পরবর্তী নির্বাচনে তাদের পক্ষে জেতা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমাদের বিরাজমান স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা বিবর্জিত এবং অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নির্বাচনে জিতলে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন ও ফায়দা প্রদানের 'রাজত্ব' তৈরি করা যায়। পক্ষান্তরে নির্বাচনে হারলে দমন-পীড়ন ও মামলা-হামলার শিকার হতে হয়। তাই সঙ্গত কারণেই আমাদের বড় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে হারার ঝুঁকি নিতে চায় না, বরং তারা ছলে-বলে-কলে-কৌশলে নির্বাচনে জেতা নিশ্চিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ কারণেই আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার ইস্যুটি সমাধানে অনাগ্রহী।

২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ হওয়ার পর থেকে বিরোধী দল বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে সারাদেশে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিরোধী দল কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করলেই সরকারের পক্ষ থেকে বহুকণ্ঠে ও উচ্চস্বরে কোরাস শুরু হয় যে, বিরোধী দল যুদ্ধাপরাধের বিচার বানচাল তথা জামায়াতের এজেণ্ডা বস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি কিছু উচ্চ পদস্থ ব্যাক্তি বেগম খালেদা জিয়াকে জামায়াতের আমির বলেও আখ্যায়িত করেছেন। এভাবে অনেক দিন থেকেই সরকারের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে বিএনপি'র 'জামায়াতেকীকরণের' একটি প্রচেষ্টা চলে আসছে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বিএনপিও যেন বিভিন্নভাবে এতে সাগ্রহে সায় দিচ্ছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিএনপির জামায়াতেকীকরণের তথা বিএনপিকে একটি ধর্মীয় উগ্রবাদী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এ প্রচেষ্টার দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল অত্যবন্ত ভয়াবহ। কারণ বিএনপি তার নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়ে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির মধ্যে বিলীন হয়ে গেলে, এদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদকে প্রতিহত করা অসম্ভব হবে বলে অনেকের ধারণা।

(৪) হরতাল ও তার ক্ষয়ক্ষতি

যুদ্ধাপরাধের বিচার বন্ধের দাবিতে জামায়াত-শিবির এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপি এ বছরেই সারাদেশে ৩৫ দিনের মত হরতাল পালন করেছে। হরতাল একটি গুজরাটি শব্দ এবং গান্ধীর ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ, অহিংস ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে এর উৎপত্তি। কিন্তু এখন আমাদের দেশে জোর করে গাড়ী পোড়ানোসহ বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক ও সহিংস কার্যক্রমের মাধ্যমে হরতাল পালন করাতে বাধ্য করা হয়, যদিও হরতালের মত ধ্বংসাত্মক কর্মসূচির মাধ্যমে কোনো সমস্যারই স্থায়ী ও টেকসই সমাধান হয় না।

শুধু সহিংসতাই নয়, হরতালের ফলে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতিও সাধিত হয়। হরতালের সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির কোনো নির্ভরযোগ্য হিসাব নেই। এফবিসিসিআই-এর সাম্প্রতিক হিসাব মতে হরতালের দৈনিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা, যা অবাস্তব বলে অনেকের ধারণা। পক্ষান্তরে ডিসিসি'র হিসাব অনুযায়ী এর সরাসরি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক এক হাজার ৬০০ কোটি টাকা, যাও সম্ভবত অতিরঞ্জিত। তবে সরাসরি ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও হরতালের মধ্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত এবং ভবিষ্যত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এছাড়াও হরতাল, যা রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক অনিশ্চয়তারই প্রতিফলন, অবৈধ অর্থ পাচারকেও উৎসাহিত করে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখন ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজমান। অনেক বিদেশী পর্যবেক্ষকের মতে বাংলাদেশের সামনে একটি উজ্জল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। অনেকে মনে করেন, আগামী কয়েক দশকে বাংলাদেশ এমনকি ইউরোপের অনেক দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু হরতাল তথা রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশের ভাবমুর্তি ভুলুণ্ঠিত করে এ সম্ভাবনাকে বহুলাংশে ধ্বংস করে দিতে পারে বলে এখন অনেকের আশংকা।

(৫) বিরোধী দলের দমনপীড়ন

নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে সরকার ও প্রধান বিরোধী দলের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না করে সরকার যেন হার্ডলাইন ধরেছে এবং নজিরবিহীন দমনপীড়নের আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক মূল্যাবোধ গড়ে উঠেনি এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণুতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও নিপীড়ন বহু দিন থেকেই চলে আসছে। এধরনের অপরাজনীতির জঘন্যতম প্রতিফলন ঘটে গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার জীবনের ওপর হামলা এবং কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার প্রাণহাণির মাধ্যমে। বর্তমান সরকার অতীতের পথই দমনপীড়ন নীতিই যেন অনুসরণ করে চলছে।

হরতালের সংস্কৃতিও আমাদের দেশে বহু পুরানো। হরতালের সময়ে গাড়ী পোড়ানোসহ অন্যান্য সহিংসতাও আমাদের দেশে গত দুই দশক থেকে চলে আসছে। কিন্তু কোথায়ও কোনো কর্মী বা সমর্থক বাসে আগুন দিলে বা বোমা ফাটালে, সেই অপরাধে ঢালাওভাবে কেন্দ্রিয় নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাদেরকে গ্রেফতার করা, দ্রুত বিচার আইনে তাঁদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে চার্জসিট প্রদান ও গ্রহণের ঘটনা অনেকের কাছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ হিসেবেই প্রতীয়মান হয়। কথিত এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগে সরকার গত এক বছরে আটটি মামলার অভিযোগপত্রে বিএনপি ও তার নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের ২৮২ জন নেতাকে আসামি করা হয়েছে (*প্রথম আলো, ১৮ এপ্রিল ২০১৩*) । ইতোমধ্যে বিএনপির প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ নেতার বিরুদ্ধে নানা হাস্যকর অভিযোগে অসংখ্য মামলা দায়ের করে সরকার তাঁদের অনেককে গ্রেফতার করেছে, আদালত (কথিত সরকারি প্রভাবে) জামিন না দিয়ে তাঁদেরকে রিমাণ্ডে পাঠিয়েছে এবং অনেককে ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে, সারাদেশে সরকার বিএনপির বিরুদ্ধে ২০ হাজার মামলা দায়ের করেছে যার আসামী লক্ষাধিক (*বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৭ এপ্রিল ২০১৩*)। এসব মামলার অধিকাংশই হরতালে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, পুলিশের কাজে বাধা দান, দুর্নীতি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কটুক্তি, মানহানি, চাঁদাবাজি, লুটপাট, নারী নির্যাতন, হত্যা ও হত্যাপ্রচেষ্টা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, সংঘর্ষ ইত্যাদির অভিযোগে দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও বিএনপির মহাসচিবকে অন্তত তিনবার জেলে প্রেরণ করা হয়েছে, যদিও বর্তমান সরকার বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ার অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ক্ষমতায় এসেছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দমনপীড়নের মাধ্যমে কোনো দিন সমস্যার সমাধান হয় না, বরং তা আরও প্রকট হয় ও জটিল আকার ধারণ করে। এর মাধ্যমে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করা যায় না। তাই বর্তমান সরকার যেন একটি অযৌক্তিক ও আত্মঘাতী খেলায় মেতেছে।

(৬) চলমান অপশাসন

বর্তমান মহাজোট সরকার 'দিনবদলের' অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় এসেছে। দিনবদলের সনদে সুস্পষ্টভাবে 'রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ, দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনোপর্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশী শক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়। আরও অঙ্গীকার করা হয় সন্ত্রাস নির্মূল, মানবাধিকার সংরক্ষণ, বিকেন্দ্রিকরণ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার। ক্ষমতাধরদের সম্পদের হিসাব প্রদান ও জনসম্মুখে প্রকাশ, তাদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন, রাজনৈতিক প্রভাব এবং দলীয়করণমুক্ত প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠাও ছিল বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারের অংশ। লক্ষণীয় যে, এসব অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য কোনো অর্থকড়ির প্রয়োজন ছিল না, শুধু প্রয়োজন ছিল প্রজ্ঞা, সদিচ্ছা ও অনমনীয়তা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সরকারের আমলে অতীতের অপশাসনই যেন অব্যাহত রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে আরও ভয়াবহ রূপে।

শেয়ার বাজার, পদ্মা সেতু ও হলমার্ক কেলেঙ্কারি, ডেসটিনির সীমাহীন লুটপাট বন্ধে ব্যর্থতা ইত্যাদি বর্তমান সরকারের অপশাসনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এছাড়াও বর্তমান সরকারের আমলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নিয়োগ বাণিজ্য, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ফায়দাবাজি ইত্যাদি এ সরকারের আমলে এমন অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান গত বছর হতাশার স্বরে বলেছেন যে, দেশটা যেন এখন 'বাজিকরদের' হাতে। উপরন্তু মানবাধিকার পরিস্থিতিও যেন আগের মতই নাজুক। যেমন, গত চার বছরে ৪৬২ জন ক্রসফায়ারে নিহত এবং ১৫৬ জন গুম হয়েছে (*আমাদের সময়*, ১৮ এপ্রিল, ২০১৩), যদিও সরকার এক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্সে'র অঙ্গীকার করেছিল।

(৭) হেফাজতে ইসলামের উত্থান

বর্তমান সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হেফাজতে ইসলামের উত্থান। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, সেক্টরস কমান্ডারস ফোরামসহ ২৭টি সংগঠনের নজিরবিহীনভাবে ডাকা শুক্র-শনিবারের হরতাল ও সরকারের সর্বাত্মক বাধা উপেক্ষা করে হেফাজতে ইসলাম গত ৬ এপ্রিল ১৩ দফা দাবিতে লাখ লাখ ব্যক্তিকে ঢাকায় জমায়েত করতে সক্ষম হয়। তাদের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশে ইসলামী শাসন কায়েম করা (*আমাদের সময়*, ১৭ এপ্রিল, ২০১৩), যা কোনভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও তাদের কিছু দাবি বাক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের পরিপন্থী। নারীদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকের মধ্যে শঙ্কার উদ্রেক করে।

হেফাজতে ইসলামের অভূতপূর্ব উত্থানের পেছনে শক্তি যোগাচ্ছে মূলত আমাদের বিদ্যমান বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সারা দেশে ছড়ানো-ছিটানো অসংখ্য কওমী মাদ্রাসা। এছাড়া সাধারণ মানুষের সীমাহীন বঞ্চনাও তাদেরকে এসব ধর্মীয় সংগঠনগুলোর প্রতি আকৃষ্ট করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে গরিব মানুষ, যাদের অধিকাংশই গ্রামে বাস করে, পদে পদে 'ভিকটিম' এবং তাদের মর্যাদা প্রতিনিয়ত ভূলুণ্ঠিত। থানা, অন্যান্য সরকারি অফিস, এমনকি নিম্ন আদালতে গেলে তাদের কাজ হয় না কিংবা তারা প্রয়োজনীয় প্রতিকার পান না, কারণ তাদের উৎকোচ দেওয়ার টাকা নেই, নেই তদবির করার কেউ। এমনকি ভিজিডি-ভিজিএফ কার্ড দলীয় নেতা-কর্মীদের 'পোষার' কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এগুলো থেকেও অনেক গরীব মানুষ এখন বঞ্চিত। গ্রামীণ শিক্ষার মানে ধ্বস নামার ফলে তাদের সন্তান এখন পিয়ন-চাপরাশীর ছাড়া অন্য চাকুরী পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে না। নিয়োগ বাণিজ্যে ও তদবিরতন্ত্রের দৌরাত্মে সে চাকুরীও তাদের সন্তানের জন্য আজ অনেকটা সোনার হরিণ। এ ধরনের সীমাহীন বঞ্চনার বিরুদ্ধে ফরিয়াদের কোন স্থান না থাকার কারণেই অনেকে সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী হন। এছাড়াও তারা বর্তমান সংঘাতময় রাজনীতির অবসান চায়, চায় শান্তি। সাধারণ মানুষের এ ধরনের বঞ্চনা আমাদের দেশে উগ্রবাদের জন্য এক উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ফেলেছে।

প্রয়োজন সংলাপ ও সংস্কার

উপরে বর্ণিত বিরাজমান অবস্থা আমাদের জন্য এক অসহনীয় ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং জাতিকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ আজ জরুরি। এজন্য প্রথমেই, স্বল্প মেয়াদীভাবে প্রয়োজন হবে যথা সময়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখা। একইসঙ্গে যুদ্ধপরাধীদের বিচার স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণে যথাসময়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হলে প্রয়োজন হবে অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও কতগুলি বিষয়ে ঐক্যমত্য, যদিও এর কোনো লক্ষণ এখনও দেখা যায় না।

কিন্তু নির্বাচন হলেই হবে না, নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সুশাসন কায়েম হতে হবে। সাধারণ মানুষের বঞ্চনা লাঘবের পথ প্রশস্ত, তাদের মর্যাদা সমুন্নত এবং তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়াও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে হবে। আর এজন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিতে হবে। নিতে হবে অনেকগুলো সুদূরপ্রসারী সংস্কার উদ্যোগ। একই সঙ্গে ধর্মীয় উগ্রবাদকে প্রতিহত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এসব দীর্ঘ মেয়াদী ও পরিবর্তনের জন্যও প্রয়োজন হবে প্রধান রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের মধ্যে কতগুলো বিষয়ে ঐক্যমত্য। এলক্ষ্যেও প্রয়োজন জরুরি ভিত্তিতে সংলাপ। সংলাপ অনুষ্ঠানের আবশ্যক পূর্বশর্ত হতে হবে সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের নেতাদের অবিলম্বে কারামুক্ত করা এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে রাজপথের আন্দোলন বন্ধ করা, যা আলাপ-আলোচনার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

আবারও তিনজোটের রূপরেখা

অনেকেরই মনে আছে যে, দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পর ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ তারিখে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সবার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই অর্জনের পেছনে ছিল ১৫ দল, ৭ দল ও ৫ দলের সমন্বয়ে গঠিত একটি 'তিনজোটের রূপরেখা' যা যুক্ত ঘোষণা হিসেবে প্রকাশিত হয়। আমরা মনে করি যে, আমাদের বর্তমান অচলাবস্থা ও অনিশ্চয়তা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন আবারও এমন একটি রূপরেখা। এ রূপরেখার যৌথ রূপকার হতে পারে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট, বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট এবং ড. কামাল হোসেন-ড. বি চৌধুরী-বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-এলডিপি, বাসদ, জাসদসহ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দলের সমন্বয়ে গঠিত অন্য আরেকটি জোট। এ উদ্যোগের সঙ্গে অবশ্য যুক্ত হতে পারেন নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা।

এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে নব্বইয়ের গণ আন্দোলনের সময়ে, স্মরণ করা যেতে পারে যে, তিনজোটের রূপরেখায় তিনটি জিনিষ অন্তর্ভুক্ত ছিল: (১) অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে একটি নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ অন্তবর্তীকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি; (২) নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য অবশ্য পালনীয় একটি আচরণবিধি; এবং (৩) নির্বাচন পরবর্তীকালে নতুন সরকারের জন্য কতগুলো অবশ্য করণীয়।

তিনজোটের রূপরেখায় নির্দলীয় অন্তবর্তীকালীন সরকারের জন্য নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন, তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান, শুধুমাত্র রুটিন কাজে নিজেদেরকে নিবিষ্ট রাখা, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা ইত্যাদি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। আচরণবিধিতে নয়টি অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো, সংঘাত পরিহার করা, পরস্পরিক কুৎসা রটনা থেকে বিরত থাকা, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া, প্রশাসনকে প্রভাবিত না করা, সরকারি প্রচার মাধ্যমের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, সকল বিরোধের তাৎক্ষণিকভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করা, নির্বাচনের দিনে সকল কারচুপি ও দুর্নীতির অবসান করা, নির্বাচনী ব্যয়সীমা মেনে চলা, নির্বাচনের মাধ্যমে প্রদত্ত গণরায় মেনে নেওয়া ইত্যাদি। নির্বাচন পরবর্তীকালে নতুন সরকারের উল্লেখযোগ্য করণীয় মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সংসদকে কার্যকর করার মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, কোনোরূপ অসাংবিধানিক পন্থায় নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত, তিনজোটের দাবি অনুযায়ী জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাহাবউদ্দিন আহমেদ নেতৃত্বে গঠিত একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ আচরণবিধি পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে। ফলে একানব্বইয়ের সংসদ নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছিল। সব দল নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিয়েছিল, যদিও তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সুক্ষ কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন। তবে একানব্বইয়ের নির্বাচন পরবর্তী সরকারগুলো দুর্ভাগ্যবশত তিনজোটের রূপরেখার অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়ন করেনি, যার চরম মাসুল জাতি হিসেবে আজ আমরা দিচ্ছি।

বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আমাদের করণীয়গুলোকেও, তিনজোটের রূপরেখার অনুসরণে, তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) নির্বাচন-পূর্ববর্তী করণীয়, (২) নির্বাচনকালীন সময়ে করণীয়, এবং (৩) নতুন সরকারের করণীয়। প্রথম দুটি হবে আশু করণীয় এবং শেষটি হবে দীর্ঘ মেয়াদী করণীয়।

(১) নির্বাচন-পূর্ববর্তী করণীয়

(ক) **নির্বাচনকালীন একটি নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা**। প্রথমেই দলগুলোকে, বিশেষত ক্ষমতাসীন দলকে নির্বাচনকালীন একটি নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার জনদাবির বিষয়ে একমত হতে হবে। এব্যাপারে একমত হলেই সুনির্দিষ্ট ফর্মুলা নিয়ে আলাপ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফর্মুলার ক্ষেত্রে টিআইবির প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে। তবে টিআইবির প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সমস্যা হল যে, যে সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের সদস্যদের নাম প্রস্তাবিত হওয়ার কথা, দলীয় আনুগত্যের কারণে সে কমিটির পক্ষে সিদ্ধান্তে পৌঁছা প্রায় অসম্ভব হয়ে যেতে পারে, যেমনি ঘটেছে পাকিস্তানের সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত অনুসন্ধান কমিটির ক্ষেত্রে। কারণ দলীয় ব্যক্তিদের পক্ষে তাঁদের নেত্রীদের অভিপ্রায়কে অমান্য করা অসম্ভব হতে পারে। তাই একটি বিকল্প প্রস্তাব হতে পারে আমাদের অবসরপ্রাপ্ত সাবেক প্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন, যে কমিটি নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নির্ধারণ ও অন্য দশজন উপদেষ্টা পদের জন্য ১৫ জনের নাম প্রস্তাব করবে, যা থেকে নির্ধারিত প্রধান উপদেষ্টা দশ জনকে বেছে নেবেন। যেহেতু সাবেক প্রধান বিচারপতিরা জেষ্ঠ নাগরিক এবং ভবিষ্যতে তাঁদের পাবার কিংবা হারানোর কিছু নেই, তাই তাঁরা নাম প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করবেন বলে আশা করা যায়। প্রসঙ্গত, বর্তমান লেখক এ ধরনের একটি প্রস্তাব সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ কমিটির সামনে উত্থাপন করেছিল।

(খ) **নির্বাচন কমিশনের শক্তিশালীকরণ**। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা বহুদিন থেকে বলে আসছে, যদিও এলক্ষ্যে এখন পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। এছাড়া এমন কোনো মহৌষধ নেই যা সেবন করালে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কমিশন শক্তিশালী হবে যদি সৎ, যোগ্য, নিরপেক্ষ, দক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিরা কমিশনে নিয়োগ পান এবং কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়। বর্তমান কমিশনের সদস্যগণ সম্মানিত ব্যক্তি, কিন্তু তাঁদের অনেকের যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে অনেক নাগরিকই সন্দিহান। গত বছর খানেকের কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁরা অধিকাংশ জনগণের আস্থা অর্জন করতে

পেরেছেন বলেও মনে হয় না। এছাড়া প্রধান বিরোধী দল ইতোমধ্যেই বর্তমান কমিশনের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেছে। তাই গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের খাতিরে কমিশনের পুনর্গঠনের কথা আজ গভীরভাবে ভাবতে হবে।

(গ) **নির্বাচনী আইনের সংস্কার ও এর যথার্থ প্রয়োগ**। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের খাতিরে নির্বাচনী আইনে কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। যেমন, না-ভোটের বিধান, তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সুপরিশের ভিত্তিতে – বিদ্যমান আইনের বিধানানুযায়ী, শুধু বিবেচনায় নিয়ে নয় – দলীয় মনোনয়ন প্রদান, বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার সুযোগ প্রদান ইত্যাদি *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে* অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতাও নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। যেমন, বর্তমান আইনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠন ও বিদেশী শাখা থাকা অবৈধ, কিন্তু আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো আইনের এ বিধানগুলো প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। একইসঙ্গে নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধের কার্যকর আইনগত পদক্ষেপ নিতে হবে। নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করে সংসদে সাধারণ মানুষের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সন্ত্রাসী, ঋণখেলাপি, দুর্নীতিবাজ, কালোটাকার মালিকদের মতো অবাঞ্চিত ব্যক্তিরা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে এবং নির্বাচিত হলে তাদের সংসদ সদস্যপদ খারিজ হয়, সে লক্ষ্যে আইনি বিধানকে কঠোর করতে হবে। নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত মীমাংসা করতে হবে।

(ঘ) **হলফনামার মাধ্যমে তথ্য প্রদানে কড়াকড়ি**। সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়ে না আসার সুযোগ পেলে নির্বাচন অর্থবহ হবে না। তাই বর্তমান হলফনামার ছকটিতে পরিবর্তন আনতে হবে, প্রদত্ত তথ্য গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে এবং মিথ্যা তথ্য দিয়ে কিংবা তথ্য গোপন করে কেউ নির্বাচিত হলে তাদের নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতা কমিশনকে দিতে হবে।

(২) নির্বাচনকালীন সময়ে করণীয়

নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক করতে হলে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে একটি যুগোপযুগি আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনজোটের রূপরেখায় আন্তর্ভুক্ত আচরণবিধি এবং *নির্বাচনী বিধিমালা, ২০০৮*-এ অন্তর্ভুক্ত বিদ্যমান আচরণবিধির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

(৩) নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে করণীয়

(ক) সংসদকে সত্যিকারের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলে ও কার্যকর করে সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে হবে।

(গ) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে অযোগ্য, অদক্ষ ও পক্ষপাতদুষ্ট বিচারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। গত ও বর্তমান সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত উচ্চ আদালতে নিয়োগপ্রাপ্তরা 'ডিউ ডিলিজেন্সে'র বা যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে নিয়োগের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করতে হবে। নিম্ন আদালতের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সত্যিকারার্থেই বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ করতে হবে।

(ঘ) দুর্নীতি দমন কমিশনকে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

(ঙ) মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে দক্ষ ও দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে পুনর্গঠন করে কার্যকর করতে হবে।

(চ) প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার উদ্যোগ নিতে হবে।

(ছ) একটি বলিষ্ঠ বিকেন্দ্রিকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে স্বায়ত্বশাসিত, শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ (যেমন, জাতীয় বাজেটের ৪০ শতাংশ) ও ক্ষমতা এসব প্রতাষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

(জ) সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনতে হবে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে (যেমন, সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ইলেকটরাল কলেজ গঠন করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে)। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনতে হবে। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এক-তৃতীয়াংশ সংসদীয় আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে এবং এসব আসনে রোটেশনের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঝ) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার সংস্কার করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় সম্পদে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ঞ) গণমাধ্যমের ওপর সকল নিবর্তনমূলক বিধিনিষেধের অবসান ঘটিয়ে এর স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত করতে হবে। ফায়দাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে দলনিরপেক্ষ সিভিল সোসাইটি গড়ে উঠার পথকে সুগম করতে হবে।

উপসংহার

বাংলদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত জটিল ও অস্থিতিশীল। যুদ্ধাপরাধের বিচার ভণ্ডুল করার লক্ষ্যে জামায়াত-শিবিরের দেশব্যাপী তাণ্ডব, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দলের হরতাল ও সহিংস আন্দোলন, সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দমনপীড়ন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে সরকার ও বিরোধী দলের অনড় অবস্থানের কারণে আগামী নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা এই অস্থিতিশীলতার মূল কারণ। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আমাদের নব্বইয়ের তিনজোটের রূপরেখার মত সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণে প্রণীত আরেকটি যুক্ত ঘোষণা আজ প্রয়োজন। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও সবার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটানো এবং নির্বাচন পরবর্তীকালে কতগুলো সুদূরপ্রসারী সংস্কারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নব্বইয়ের মত এ ঘোষণায়ও থাকবে: (১) নির্বাচন-পূর্ববর্তী করণীয়, (২) নির্বাচনকালীন সময়ে করণীয়, এবং (৩) নতুন সরকারের করণীয়।

নির্বাচনকালীন একটি নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা এবং কতগুলো আইনি সংস্কারের ও কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও সবার অংশগ্রহণে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান হবে নির্বাচন-পূর্ব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। সবার অংশগ্রহণে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন এবং তা মেনে চলা হবে নির্বাচনকালীন কার্যক্রম। নির্বাচন-পরবর্তী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে কতগুলো সুদূরপ্রসারী সংস্কার উদ্যোগ, যা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে এবং সাধারণ মানুষের বঞ্চনার অবসান ঘটাবে।

এমন একটি রূপরেখা বা যুক্ত ঘোষণা প্রণয়নের আজ সব রাজনৈতিক দলকে একত্রে বসতে এবং সংলাপে নিয়োজিত হতে হবে। গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও এ সংলাপে অংশ নিতে পারেন। সংলাপে যেসব বিষয়ে ঐক্যমত্য সৃষ্টি হবে সেগুলো সবার স্বাক্ষরে যুক্ত ঘোষণা হিসেবে জাতির সামনে প্রকাশ করা হবে এ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সংলাপ অনুষ্ঠানের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অবশ্য প্রয়োজন হবে সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান বিরোধী দলের নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদান এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে হরতালসহ সকল ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের অবসান।

সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণে এমন একটি রূপরেখা প্রণয়ন এবং যুক্ত ঘোষণা হিসেবে এর প্রকাশ অত্যন্ত কাঙ্খিত হলেও, তা ঘটার সম্ভাবনা বর্তমান সময়ে নেই বললেই চলে। কারণ আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার রাজনীতির কাছে পুরো জাতি আজ জিম্মি। তাই জাতির এ যুগসন্ধিক্ষণে নাগরিকদেরকেই এমন একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে হবে। উদ্যোগ নিতে হবে রূপরেখাটি সম্পর্কে জনমত তৈরি করে তা প্রয়োগে রাজনীতিবিদদের বাধ্য করতে। তা না হলে জাতি হিসেবে আমরা এক চরম সংকটের দিকে ধাবিত হতে পারি।